Vol. 43 | No. 1 | 1999

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

তিতাস একটি নদীর নাম : আঞ্চলিক জীবনের রূপায়ণ

Volume	43
Issue	1
Year	1999
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Gias Shamim
Published online	October 1, 1999
DOI	10.62328/sp.v43i1.7
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v43i1.7
Pages	105-120
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

তিতাস একটি নদীর নাম : আঞ্চলিক জীবনের রূপায়ণ

মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দিন*

বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে নদী এবং নদী-তীরবর্তী জনপদ অবলম্বনে উপন্যাস-রচনার সূত্রপাত ভারত-বিভাগের পূর্ব পর্যায়ে। বিভাগোত্তরকালে নদীবাহিত বিভিন্ন অঞ্চলের সংগ্রামশীল মানুষের জীবনযাপন পদ্ধতিকে শিল্প-অন্তর্গত করে যাঁরা উপন্যাস রচনায় অগ্রসর ভূমিকা পালন করেছিলেন তাঁদের প্রেরণার উৎস ছিলেন কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০), হুমায়ুন কবির (১৯০৬-১৯৬৯), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-১৯৫৬) মতো জীবনাগ্রহী মানবতাবাদী শিল্পী-ঔপন্যাসিক। কাজী আবদুল ওদুদের *নদীবক্ষে* (১৯১৯) কিংবা হুমায়ুন কবিরের *নদী ও নারী* (১৯৪৫) আঞ্চলিক জীবনভিত্তিক না-হলেও নদীকেন্দ্রিক জীবন নিয়ে উপন্যাস-রচনায় তাঁদের আগ্রহ স্বাধীনতা-উত্তর শিল্পী-মানসকে করেছে প্রভাবিত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পদ্মানদীর মাঝি* (১৯৩৬) আঞ্চলিক জীবনভিত্তিক একটি উপন্যাস। পদ্মা-তীরবর্তী কেতুপুরের অভাবগ্রস্ত সংগ্রামশীল অস্পৃশ্য ধীবর-সম্প্রদায়কে শিল্প-অন্তর্গত করে এ-উপন্যাস রচনা করেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভাগপূর্ব পর্যায়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় নদী-তীরবর্তী অঞ্চল অবলম্বনে রচনা করেছেন *কালিন্দী* (১৯৪০) এবং *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* (১৯৪৭)। কালিন্দী নদী-তীরবর্তী বিপুল মানুষের ভাঙা-গড়া, উত্থান-পতন, সংগ্রাম-সংক্ষোভের বিশ্বস্ত বর্ণনায় *কালিন্দী* হয়ে উঠেছে বীরভূমের একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের জীবনকথা। *হাঁসুলী বাঁকের উপকথায়* শব্দরূপ পেয়েছে হাঁসুলী বাঁকের লোকায়ত মানুষের বহুবর্ণিল জীবনচিত্র।

বিভাগোত্তর কালপ্রবাহে বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকগণ নদী-তীরবর্তী অঞ্চল নিয়ে রচনা করেছেন সীমিতসংখ্যক উপন্যাস। বলাবাহুল্য, সময়ের সুস্পষ্ট ব্যবধান সত্ত্বেও এ-পর্যায়ের ঔপন্যাসিকদের অনেকেই তিরিশোত্তর শিল্পবোধকে স্পর্শ করতে সক্ষম হন নি। জীবন এবং জীবন - পরিপ্রেক্ষিত অনুধাবন ও বিশ্লেষণে তাঁরা যতটুকু ছিলেন উচ্ছ্বাস-আক্রান্ত, ঠিক ততটুকু ছিলেন অভিজ্ঞতা-বর্জিত। তবু এ-পর্বে আমাদের ঔপন্যাসিকদের চেতনালোক যে স্পষ্টতই পরীক্ষাপ্রবণ হয়ে উঠেছে তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। এ-পর্যায়ে বাংলাদেশের প্রধান-প্রধান নদীকে শিরোনামরূপে ব্যবহার করে যে কয়টি উপন্যাস রচিত হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে অদ্বৈত মল্লবর্মণের (১৯১৪-১৯৫১) *তিতাস একটি নদীর নাম* (১৯৫৬) বিষয়গৌরবে নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ।

তিতাস একটি নদীর নাম বাংলাদেশের আঞ্চলিক উপন্যাস-সাহিত্যে একটি যুগান্তসৃষ্টিকারী সংযোজন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত তিতাস নদী তীরবর্তী অঞ্চলের দরিদ্র, অভাবগ্রস্ত, পরিশ্রমজীবী মালো[১] সম্প্রদায়ের আশা-নিরাশা, আনন্দ-বেদনা, শ্রম-বিশ্রাম, সংকীর্ণতা-ঔদার্যকে

---

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

লেখক শিল্পরূপ দিয়েছেন। তিতাস-তীরবর্তী কৃষক সম্প্রদায়ের জীবন-বাস্তবতাও অসাধারণ নৈপুণ্যে অঙ্কিত হয়েছে এ-উপন্যাসে।

তিতাস একটি নদীর নাম চারখণ্ডে সমাপ্ত বৃহদায়তন উপন্যাস। উপন্যাসে তিতাস-তীরবর্তী মালোদের জীবনচিত্রাঙ্কনে লেখকের দক্ষতা বিস্ময়কর। তিতাস-তীরের রঙ-রেখা, পরিবেশ-প্রতিবেশের সঙ্গে উপন্যাস-বিধৃত ঘটনাপুঞ্জের রয়েছে সুগভীর ঐক্য। উপন্যাসের প্রতিটি ঘটনাই যেন এ-অঞ্চলের রঙে রঙিন।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ তাঁর আশৈশব-অর্জিত অভিজ্ঞতারই বাণীরূপ দিয়েছেন এ-উপন্যাসে। তিতাস-তীরে বেড়ে-ওঠা এ-ঔপন্যাসিক উপন্যাস রচনাকালে ছিলেন তিতাস থেকে দূরবর্তী অবস্থানে — নগর কোলকাতায়। যার পরিপ্রেক্ষিতে উপন্যাসের ঘটনাধারা, পরিণাম ও প্রতিপাদ্য নির্ণয়ে তিনি ব্যবহার করেছেন স্মৃতিবিধুর অনুষঙ্গ। তবু আঞ্চলিক জীবনের সরল ও নিপুণ বিন্যাসে উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে অসাধারণত্বে ভাস্বর।

তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসে তিতাস এবং তিতাস-তীরবর্তী অঞ্চলের 'Local colour and habitations' পরমসূক্ষ্ম পরিচর্যায় উপস্থাপিত হয়েছে। নদীপ্রধান বাংলাদেশে তিতাসের রয়েছে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। স্বভাবধর্মে এটি বাংলাদেশের অপরাপর নদী থেকে পৃথক। উপন্যাসের প্রারম্ভিক পর্যায়ে লেখকের এতদ্বিষয়ক ভাষ্য নিম্নরূপ :

> তিতাস একটি নদীর নাম। তার কূলজোড়া জল, বুকভরা ঢেউ, প্রাণভরা উচ্ছ্বাস। স্বপ্নের ছন্দে সে বহিয়া যায়। ...
>
> তিতাস শাহী মেজাজে চলে। তার সাপের মতো বক্রতা নাই, কৃপণের মতো কুটিলতা নাই। কৃষ্ণপক্ষের ভাঁটায় তার বুকের খানিকটা শুষিয়া নেয়, কিন্তু কাঙ্গাল করেনা। শুক্লপক্ষের জোয়ারের উদ্দীপনা তাকে ফোলায়, কিন্তু উদ্বেল করেনা।
>
> কত নদীর তীরে একদা নীল-ব্যাপারীদের কুঠি-কেল্লা গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাদের ধ্বংসাবশেষ এখনও খুঁজিয়া পাওয়া যায়। কত নদীর তীরে মোগল-পাঠানের তাঁবু পড়িয়াছে, মগদের ছিপনৌকা রক্ত লড়াইয়ে মাতিয়াছে — উহাদের তীরে কত যুদ্ধ হইয়াছে। ... তিতাসের বুকে তেমন কোন ইতিহাস নাই। সে শুধু একটা নদী।[২]

এ-রকম সহজ ও সাবলীল ভঙ্গির কারণেই তিতাস বাংলাদেশের নদীর মধ্যে স্বতন্ত্র। এর উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিহাসও রহস্যমণ্ডিত। ঔপন্যাসিকের বর্ণনাংশ লক্ষণীয় :

> দুরন্ত মেঘনা নাচিতে নাচিতে কোন্‌কালে কোন্ অসতর্ক মুহূর্তে পা ফসকাইয়াছিল; বাঁ তীরটা একটু মচকাইয়া গিয়া ভাঙিয়া যায়। স্রোত আর ঢেউ সেখানে প্রবাহের সৃষ্টি করে। ধারা সেখানে নরম মাটি খুঁজিয়া, কাটিয়া, ভাঙিয়া, দুমড়াইয়া পথ সৃষ্টি করিতে থাকে। এক পাকে শত শত পল্লী দুই পাশে রাখিয়া অনেক জঙ্গল অনেক মাঠ-ময়দানের ছোঁয়া লইয়া ঘুরিয়া আসে — মেঘনার গৌরব আবার মেঘনার কোলেই বিলীন হইয়া যায়। এই তার ইতিহাস। ... অনেক দূর পাল্লার পথ বাহিয়া ইহার দুই মুখ মেঘনায় মিশিয়াছে। পল্লী রমণীর কাঁকনের দুই মুখের মধ্যে যেমন একটু ফাঁক থাকে, তিতাসের দুই মুখের মধ্যে রহিয়াছে তেমনি একটুখানি ফাঁক — কিন্তু কাঁকনের মতই তার বলয়াকৃতি।[৩]

উপর্যুক্ত বর্ণনাংশ উপন্যাসের ১-সংখ্যক খণ্ডের 'তিতাস একটি নদীর নাম' অধ্যায়ের অন্তর্গত। এ-বর্ণনাংশ দার্শনিকতামণ্ডিত। তিতাস-তীরবর্তী অঞ্চলের স্থানিক বর্ণিমা এতে প্রতিফলিত হয়েছে। 'প্রবাস খণ্ডে'র শুরুতে তিনি মালোপাড়ার অবস্থা-অবস্থান, ঘর-গেরস্থালির স্বরূপ অঙ্কন করেছেন এভাবে :

> তিতাস নদীর তীরে মালোদের বাস। ঘাটে-বাঁধা নৌকা, মাটিতে ছড়ানো জাল, উঠানের কোণে গাবের মট্‌কি, ঘরে ঘরে চরকি, টেকো, তক্‌লি — সূতা কাটার, জাল বোনার সরঞ্জাম। এই সব নিয়াই মালোদের সংসার।
>
> নদীটা যেখানে ধনুকের মত বাঁকিয়াছে, সেইখান হইতে গ্রামটার শুরু। মস্ত বড় গ্রামটা, — তার দিনের কলরব রাতের নিশুতিতেও ঢাকা পড়েনা। দক্ষিণ পাড়াটাই গ্রামের মালোদের।[৪]

মালোপাড়ার মালো সম্প্রদায়ের একটি পূজাব্রতকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের কেন্দ্রীয় ঘটনাংশ উন্মোচন করেছেন লেখক। এ-পূজাব্রতের নাম 'মাঘমণ্ডলের ব্রত'। ব্রতের স্থায়িত্বকাল সারা মাঘ মাস। এ-মাসে কুমারী কন্যারা প্রার্থিত বরের আকাঙ্ক্ষায় পূজা করে। পূজা উপলক্ষে দীননাথ মালোর সপ্তবর্ষীয়া কন্যা বাসন্তীর প্রতি অনুরাগবশত কিশোর আর সুবলকর্তৃক চৌয়ারি নির্মাণকে কেন্দ্র করে তিতাস-তীরবর্তী ধীবর পল্লির একটি চিরায়ত বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। দুঃখ-দারিদ্র্য, হতাশা-বঞ্চনার মধ্যেও মালোরা এসব উৎসব-অনুষ্ঠান সযত্ন পরিচর্যায় টিকিয়ে রেখেছে।

অধিকাংশ মালো শিশু পাঠশালাবিমুখ। মৎস্যই যেহেতু তাদের জীবিকার প্রধান উৎস-উপকরণ, সেহেতু পাঠশালায় হাতেখড়ির পরিবর্তে তাদের হাতে-খড়ি হতো নৌকা-জালে। স্বল্পকালের ব্যবধানে তারা হয়ে উঠতো নিপুণ জেলে। তাই শৈশব-কৈশোরের আনন্দমুখর দিনগুলোতেও তারা গৃহকোণে অলস ও নিশ্চুপভাবে সময়ক্ষেপণ না-করে মৎস্য শিকারের জন্য তিতাসে বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু তিতাসে মাছের পরিমাণ অফুরন্ত নয়। হয়ত তাই প্রাণরক্ষার তাগিদে তারা শরণাপন্ন হয় অন্য নদীর। কিশোর ও সুবলের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয় না। একদিন তারাও প্রবীণ জেলে তিলকচাঁদকে নিয়ে অধিক উপার্জনের আশায় শুকদেবপুরের উজানি নগরের খলার উদ্দেশে যাত্রা করে। যথাসময়ে তারা উপনীত হয় বাঁশিরাম মোড়লের ঘাটে। সেখানে মোড়ল পরিবারের সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত আন্তরিকতায় তারা মুগ্ধ হয়। কিশোরের মনে হয় তিতাস-তীরের মনুষ্যপ্রকৃতির চেয়ে এখানকার মনুষ্যপ্রকৃতি কিছুটা অন্যরকম। শুধুমাত্র বাহ্য অবয়বেই নয়, অর্থনৈতিক দিক থেকেও এরা সচ্ছল। প্রকৃতি উদার দাক্ষিণ্যে এদের তুষ্ট করে রেখেছে।

শুকদেবপুরের খলায় প্রতি বৎসর দূরাঞ্চলের গ্রাম থেকে অনেক মালো পরিবার এসে ভিড় জমায়। প্রায় ছয় মাস ভিড় অব্যাহত থাকে। মালো সম্প্রদায়ের অভিজ্ঞতায় এর প্রচলিত নাম 'খলা-বাওয়া'। এ 'খলা-বাওয়া' একটি পরিবারের কোনো-এক তন্বী তরুণীকে কেন্দ্র করে চৈত্রের মধ্য পর্যায়ে ফাগ-রাঙানো দোল পূর্ণিমার উৎসবে কিশোর অপ্রত্যাশিত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়। বসন্তের উৎসবমুখর এ উদাত্ত দিবসে অজানা আবেগে স্পন্দিত হয় কিশোরের হৃদয় ; পরস্পরের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময়কালে অনঙ্গ দেবতা যেন তাদের অজান্তেই নিক্ষেপ করে পুষ্পশর।

দোল পূর্ণিমার উৎসবে যে-মেয়েটির রূপবিভায় মুগ্ধ ও চমকিত হয় কিশোর, সে-মেয়েটিকে মোড়ল-গিন্নির সহায়তায় গান্ধর্ব বিধানে বিবাহ করে কিশোর; এবং সেখানকার মালো সম্প্রদায়ের

স্বীকৃতি নিয়ে সে তার স্বগ্রাম গোকণঘাটের উদ্দেশে যাত্রা করে। পথিমধ্যে মেঘনার অথৈ জলে রাত্রির অন্ধকারে দস্যুদলকর্তৃক অপহৃত হয় কিশোরের স্ত্রী ও সম্পদ দুই-ই। অপ্রত্যাশিত ও মর্মান্তিক এ-ঘটনায় বিধ্বস্ত হয় কিশোরের হৃদয়। চিরকালের জন্য উন্মাদ হয়ে যায় সে।

তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড 'নয়াবসত/জন্ম মৃত্যু বিবাহ'। প্রথম খণ্ডে সংঘটিত কাহিনীর চার বৎসর পর এ-খণ্ডের কাহিনী পরিকল্পিত হয়েছে। কিশোরের স্ত্রীর নাটকীয় আবির্ভাব এ-খণ্ডের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। চার বৎসর পূর্বে নদীবক্ষে দস্যুকর্তৃক অপহৃত হয়েও অস্বাভাবিকভাবে বেঁচে-যাওয়া কিশোরের স্ত্রী কীভাবে গোকণঘাটে পুত্র অনন্তকে নিয়ে বসতি স্থাপন করেছে তা এ-খণ্ডে বর্ণনা করেছেন লেখক।

প্রথম খণ্ডের সঙ্গে দ্বিতীয় খণ্ডের স্থানিক ঐক্য ব্যতীত ঘটনাধারায় বিশেষ কোনো সংযোগ অনুপস্থিত। এ-খণ্ডে কিশোর এবং তার স্ত্রীর সম্পর্ক তেমন গুরুত্ব পায়নি। এখানে দেখা যায় — কিশোরের উন্মাদনায় তার পিতামাতা অসহায়, তাদের সংসারক্ষেত্র থেকে সুখ উধাও। ইতোমধ্যে সুবলের সঙ্গে বাসন্তীর বিয়ে হয়। বিয়ের পর নৌ-দুর্ঘটনায় মারা যায় সুবল। অতঃপর নামপরিচয়চিহ্নহীন কিশোরের স্ত্রীর সঙ্গে সখ্যভাব গড়ে ওঠে বাসন্তীর।

গোকণঘাট গ্রামে নতুন করে পুত্র অনন্তকে নিয়ে সংসারধর্ম শুরু হয় কিশোরের স্ত্রীর। অচেনা পরিবেশে পদার্পণ করে কিশোরের স্ত্রী প্রথমাবধি অনুভব করে গ্রামবাসীদের উষ্ণ আন্তরিকতা। সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে সবাই। বসতঘর নির্মাণের পর জীবন-জীবিকার জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হয় অনন্তর মা। মালোপাড়ার অধিকাংশ নারীলক্ষ্মীর মতো সেও সূতা বুননের মাধ্যমে জীবিকার্জনের উপায় করে নেয়। কৃচ্ছ্র-সাধনার মধ্য দিয়ে পুত্র অনন্তকে নিয়ে সে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখে। এক অবিশ্বাস্য স্বপ্নঘোর বাস্তবতায় পথ চলে সে। যে নতুন সমাজ-প্রাকারে সে স্বেচ্ছাবন্দিনী, সে-সমাজের প্রথা-পদ্ধতি কখনো-কখনো তাকে আতঙ্কশিহরিত করে; কম্পিতবক্ষে সে অপেক্ষা করে ভয়ঙ্কর কোনো তথ্যচিত্তের। কারণ একদিন :

> সন্ধ্যার অল্প আগে দুইটি ছেলে বাড়ি বাড়ি নিমন্ত্রণ করিতে আসিল। ছেলে দুটি পাড়ার একপ্রান্ত হইতে শুরু করিয়া প্রত্যেক বাড়িতে বলিয়া গেল, 'ঠাকুর সকল, ঘরে নি আছ, আমার একখান কথা। ভারতের বাড়িতে আজ দশজনের সভা। তোম্রার নিমন্ত্রণ। পান তামুক খাইবা, দশজনের দশকথা শুনবা।'
>
> বাঁধা কথা। অনন্তর মাও বাদ পড়িলনা। বিশেষত বৈঠকের সঙ্গে যার মামলা জড়ানো থাকে, ঘোষক জনগণের আহ্বান তাকে বিশেষভাবে জানাইবে ইহাই নিয়ম।[৫]

'দশজনের সভা'র কথা ভেবে অনন্তর মা আতঙ্কিত হয়। কারণ এ-সভায় নির্ধারিত হবে তার অদৃষ্টলিপি।

একথা ঠিক যে, ভালো ও মন্দ মানুষের মিলিত সমবায়ে নির্মিত হয়েছে গোকণঘাটের ধীবরপল্লি। এখানে অসংস্কৃত, বিকৃত ও স্থূলরুচির মানুষের সংখ্যা যেমন কম নয়, ঠিক তেমনি সংবেদনশীল মানুষও প্রচুর। নতুন গ্রামে নতুন মানুষ অনন্ত ও অনন্তর মাকে গ্রহণ-বর্জন প্রসঙ্গেও এ-মানুষগুলো হয়ে উঠতে পারে স্ব-স্বভাবে উজ্জ্বল। মালোপাড়ার প্রাকৃত জীবন-পরিবেশে বসবাস-বিষয়ে সামাজিক অনুমোদনের প্রাক্‌লগ্নে অনন্তর মা যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় তা এ-সমাজেরই অন্তর্গত বৈশিষ্ট্য। ঔপন্যাসিকের বর্ণনাংশ লক্ষণীয় :

অবশেষে উঠিল অনন্তর মার কথা। তার বুক দুরদুর করিতে লাগিল।

একথাটাও ভারতকেই তুলিতে হইল, নতুন যে লোক আসিয়াছে, আপনারা সকলেই শুনিয়াছেন। তারে নিয়া কিভাবে সমাজ করিতে হইবে আপনারা বলিয়া যান। তারে কার সমাজে ভিড়াইবেন, কিষ্ট কাকার, না দয়াল কাকার, না বসন্তর বাপ কাকার—

কৃষ্ণচন্দ্র বলিল, 'কোন্ গুষ্টির মানুষ আগে জিগাইয়া দেখ্, কোন্ কোন্ জাগায় জ্ঞেয়াতি আছে জান্'

আদেশমত সব্লার বউ তাকে জিজ্ঞাসা করিল।

অনন্তর মা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'ভইনসকল গুষ্টি-জ্ঞিয়াতির কথা আমি কিছু জানিনা।'

শুনিয়া সকলেই নিরুৎসাহ হইল। কেহই তাহাকে নিজের সমাজে লইতে আগ্রহ দেখাইলনা।

কৃষ্ণচন্দ্র বলিল, 'আমার সমাজ বিশ ঘরের। ঘর আর বাড়াইতে চাইনা'।

দয়াল চাঁদের সমাজও দশ ঘরের। প্রত্যেকটাই বড় ঘর। তার সমাজেও ঠাঁই হওয়া অসম্ভব।

মঙ্গলা বসিয়াছিল সকলের পশ্চাতে। ঠেলিয়া ঠুলিয়া আগাইয়া আসিয়া সে বলিল, 'আমার সমাজ মোটে তিন ঘরের'।

রামপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করিল, 'কারে কারে লইয়া তোর সমাজ?'

'সুবলার শ্বশুর আর কিশোরের বাপেরে লইয়া'।

'তা হইলে নতুন মানুষ লইয়া তোর সমাজ হইল চাইর ঘর'।

'হ কাকা'।[৬]

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতাংশ তিতাস-তীরের প্রাকৃত জীবনের স্বরূপকেই নির্দেশ করে। বাহ্যত সরল ও অজটিল মালো সম্প্রদায় যে মূলত বহুভঙ্গিম ও বৈচিত্র্যময় তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। মালো-জীবনের মৃত্তিকামূল সংলগ্ন হয়ে বেড়ে-ওঠা অদ্বৈত মল্লবর্মণের পক্ষেই এ-সমাজের এ-রকম বিশ্বস্ত রূপচিত্র অঙ্কন সম্ভব।

শুধু মালো সম্প্রদায়েরই নয়, তিতাস-তীরের মুসলিম সম্প্রদায়ের জীবনচিত্রও বিশ্বস্ততার সঙ্গে রূপান্বিত করেছেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ। হিন্দু-মুসলিমের সৌহার্দ্যপূর্ণ জীবনযাপন, এবং তাদের অসাম্প্রদায়িক ভাবনা-চেতনা মূর্ত হয়ে উঠেছে এ-উপন্যাসে। মালোপাড়ার মাতবর রামপ্রসাদের সঙ্গে শরীয়তুল্লা-বাহারুল্লার অন্তরঙ্গ আলাপচারিতা উপস্থাপনসূত্রে একটি অসাম্প্রদায়িক জনজীবনের চিত্রই যেন ঔপন্যাসিক অঙ্কন করেছেন।

তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসের দ্বিতীয় খন্ডের 'জন্ম মৃত্যু বিবাহ' অধ্যায়টি মালো সম্প্রদায়ের বিবিধ উৎসব ও জীবনাচার-বিষয়ক। জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ প্রসঙ্গে মালোপাড়ায় জীবনের যে সাড়া জাগে তা অভিজ্ঞতামণ্ডিত ভাষা-মাধ্যমে পরিবেশন করেছেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ। মালোপাড়ায় রাম কেশবের পরিবারের যে বেদনাময় উপাখ্যান, তা যেমন সংবেদনাময় চিত্তকে আবেগায়িত করে, ঠিক তেমনি কালোবরণের পরিবারের সুখী জীবনযাপন ও উৎসব-আনন্দ এ-জনপদের বিপুল মানুষকে দেয় বৈচিত্র্যের আস্বাদ।

মালোপাড়ায় কালোবরণের পরিবার তুলনামূলকভাবে সচ্ছল। প্রায় প্রতিটি উৎসব তারা জাঁকজমকের সঙ্গে সম্পন্ন করে। এ-পরিবারের মেজ বৌয়ের সন্তান প্রসবের সময়টি উপন্যাসে

ধারণ করে লেখক মালোপাড়ায় নবজাতককে অভ্যর্থনা জানানোর রীতি-পদ্ধতি উপস্থাপন করেছেন। বালক অনন্তের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাসঙ্গিক এলাকা উল্লেখযোগ্য :

> একদিন কালোর মাকে খুব ব্যস্ত দেখা গেল। এক দৌড়ে অনন্তদের উঠানে আসিয়া হাঁক দিল, 'অনন্তর মা, জোকার দিয়া যা'।
>
> অনন্তর মা গেল। আরো পাঁচ বাড়ির পাঁচ নারী আসিয়া মিলিত হইল। একখানা ছোট ঘরের দরজার মুখে তারা সকলে মিলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সকলের মুখেই উৎকণ্ঠা। ... একজন মনে করাইয়া দিবার ভঙ্গিতে বলিল, 'ছাইলা হইলে পাঁচ ঝাড় জোকার, মাইয়া হইলে তিন ঝাড়।'
>
> কালোর মা ঘরখানার ভিতরে থাকিয়া কি সব হুলুস্থুল করিতেছিল, গলা বাড়াইয়া বলিল, 'বিপদ সাইরা গেছে সোনা-সকল। মন খুশি কইরা জোকার দেও।'
>
> নারীরা উঠান ফাটাইয়া উলুধ্বনি করিল।[৭]

মালোপাড়ায় নবাগত শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাকে কেন্দ্র করে পালিত হয় বিবিধ আচার-অনুষ্ঠান। এ-সব অনুষ্ঠানের অন্তরাল-উদ্দেশ্য হচ্ছে শিশুর কল্যাণ। অনুষ্ঠানের রীতি-পদ্ধতি লক্ষণীয়:

> ছয় দিনের দিন ঘরে দোয়াত কলম দেওয়া হইল। এই রাতে চিত্রগুপ্ত আসিয়া সে দোয়াত হইতে কালি তুলিয়া সেই কলমের সাহায্যে শিশুর কপালে লিখিয়া যায় তার ভাগ্যলিপি।
>
> অষ্টম দিনে আট-কলাই। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে অনন্তরও ডাক পড়িল। খই, ভাজা-কলাই, বাতাসা সেও কোঁচড় ভরিয়া পাইল।
>
> তের দিন পরে অশৌচ-অন্ত। সব কিছু ধোয়া-পাখ্‌লার পর নাপিত আসিয়া কালোবরণাদি তিন ভাইয়ের তের দিনের খাপছাড়া দাড়ি কামাইয়া গেল। মন্ত্র পড়িয়া পুরোহিত উঠিয়া গেলে, উঠানে একটি চাটাই পাতিয়া তাতে ধান ছড়াইয়া দেওয়া হইল। নূতন একটা শাড়ি পরিয়া, নূতন একটা রঙিন বড় রুমালে জড়াইয়া ছেলেকোলে মেজবউ বাহির হইল। চাটাইর উপর উঠিয়া ধানগুলি পা দিয়া সারা চাটাইয়ে ছড়াইয়া দিল। এদিকে পুরনারীরা একসঙ্গে গলা মিলাইয়া গাহিয়া চলিল, 'দেখ রানী ভাগ্যমান, রানীর কোলেতে নাচে দয়াল ভগবান।[৮]

কালোবরণদের ছোট বৌয়ের ছেলের অন্নপ্রাশন প্রসঙ্গে লেখক এ-উপন্যাসে যে বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন তার প্রাসঙ্গিক অংশ নিম্নরূপ :

> 'প্রথমে স্নানযাত্রা। ছেলেকোলে ছোটবউকে মাঝখানে করিয়া গান গাহিতে গাহিতে নারীরা তিতাসের ঘাটে গেল। ছোটবউ তিতাসকে নিজে তিনবার 'প্রণাম করিল, ছেলেকেও তিনবার প্রণাম করাইল। এক অঞ্জলি জল লইয়া তারা মাথা ধোয়াইল। শাড়ির আঁচল দিয়া মুছিয়া নদীকে আবার নমস্কার করিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিল।
>
> এক মুহূর্ত বিশ্রাম করিয়া তারা চলিল রাধা মাধবের মন্দিরে। সঙ্গে এক থালা পরমান্ন। সেখানে পরমান্নকে নিবেদন করিয়া প্রসাদ করা হইল। ছোটবউ একটুখানি তুলিয়া ছেলের মুখে পুরিয়া দিল, বাকি সবটাই উপস্থিত ছেলেদের মধ্যে বিতরণ করা হইল।[৯]

কালীপূজা উপলক্ষে মালোপাড়া বিপুল সমারোহে জেগে ওঠে। বিদেশ থেকে আসা কারিগররা পূজার একমাস পূর্বে প্রতিমা নির্মাণে উদ্যোগী হয়। প্রতিমার দেহ-সংগঠনে ব্যবহৃত হয় খড়-জল-কাদামাটি। অতঃপর বিচিত্র রঙের প্রলেপে সজ্জিত হয় এক-একটি প্রতিমা। এ-পূজায় নিযুক্ত হয়

জনাকয়েক সংযমী। শুদ্ধশান্ত ধবলশ্রী বেশভূষায় তারা পূজানুষ্ঠানকে করে তোলে পবিত্র ও আকর্ষণীয়:

> ... সংযমী যারা থাকে তারা আগের দিন নিরামিষ খায়, পূজার দিন প্রাতঃস্নান করে। পূজার জল তোলে, ফুল বাছাই করে, ভোগ নৈবেদ্য সাজায় আর ফুলের মালা গলায় নামাবলী গায়ে যে পুরোহিত পূজায় বসে তার নির্দেশ মতো নানা দ্রব্য আগাইয়া দেয় এবং প্রতিমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত নানা কাজ করে। কম গৌরবের কথা নয়। তারা পুরোহিতের সাহায্যকারিনী। অর্ধেক পূজা তারাই সমাধা করে। পুরোহিত তো কেবল মন্ত্রের জোরে।[১০]

সারাদিন অভুক্ত অবস্থায় প্রচণ্ড পরিশ্রমের মাধ্যমে কারিগররা যখন তুলির শেষ প্রলেপ দিয়ে প্রতিমার আচ্ছাদন উন্মোচন করে, তখনই শুরু হয় মূল পূজানুষ্ঠান। নৈবেদ্য হাতে প্রতিমার শরীর ঘেঁষে সংযমীরা পূজামণ্ডপে ধীরে ধীরে প্রবেশ করে। এক অলৌকিক শুদ্ধ-শান্ত অনুভবে পূর্ণ হয়ে ওঠে পূজার্থীর দল। পবিত্র উপাচার সহযোগে যে-প্রসাদ প্রস্তুত হয় তা গ্রহণ করে ধর্মপ্রাণ মালোরা নিজেদের মনে করে ধন্য।

কালীপূজা উপলক্ষে আমোদ-প্রমোদ ও নৃত্য-সঙ্গীতে মালো সম্প্রদায় প্রচুর অর্থ ব্যয় করলেও উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিনে তারা অর্থব্যয় করে উত্তম ফলাহারের জন্য। এদিনের বর্ণনা লেখকের অভিজ্ঞতায় নিম্নরূপ :

> এইদিন পৌষ মাসের শেষ। পাঁচ ছ দিন আগে থেকেই ঘরে ঘরে গুড়ি-কোটার ধুম পড়ে। মুড়ি ভাজিয়া ছাতু কুটিবার তোড় জোড় লাগে। চাউলের গুড়ি রোদে শুখাইয়া খোলাতে টালিয়া পিঠার জন্য তৈরী করিয়া রাখে। পরবের আগের দিন সারারাত জাগিয়া মেয়েরা পিঠা বানায়। পিঠা রকমে যেমন বিচিত্র সংখ্যায়ও তেমনি প্রচুর। পরের দিন সকাল হইতে লাগে খাওয়ার ধুম। নারী পুরুষ ছেলে বুড়া অতি প্রত্যুষে জাগিয়া তিতাসের ঘাটে গিয়া স্নান করে। যারা জালে যায় তারাও নৌকায় উঠিবার আগে গামছা পরিয়া ডুব দেয়। ... সারাটা গ্রাম ঘুরিয়া কীর্তন করার জন্য সকলের আগে বাহির হয় মালোপাড়ার দল। ... সে সময় পুরুষেরা কীর্তন করিয়া বাড়ি বাড়ি লুট করিতে যায় আর মেয়েরা ঘরে বসিয়া নানা উপকরণের পঞ্চান্ন-ব্যঞ্জন রান্না করে।[১১]

গোকর্ণঘাট গ্রামে এভাবে বিবিধ উৎসব-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অনন্তর মা পরিবেশ-প্রতিবেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে শুরু করে। উন্মাদ কিশোরকে সে তার স্বামীরূপে নিঃসন্দিগ্ধভাবে সনাক্ত করতে ব্যর্থ হলেও অবচেতন সত্তায় সে তার প্রতি একটা বেদনাময় আকর্ষণ অনুভব করে, এবং লোকলজ্জা ও সংস্কারকে উপেক্ষা করে স্নেহময় পরিচর্যার মাধ্যমে কিশোরকে সুস্থ ও স্বাভাবিক করে তোলার সাধনায় সে ব্রতী হয়। দোল-উৎসব উপলক্ষে অপ্রকৃতিস্থ কিশোরকে আবিরে রাঙিয়ে তাদের প্রথম প্রেমাভিষেকের স্মৃতি উদ্বোধনের জন্য অনন্তর মা উদ্যোগী হয়। এর ফলে সেদিন কিশোরের স্মৃতিপথে এক অতীত দোল-উৎসবে শুকদেবপুরের দাঙ্গায় তার স্ত্রীর মূর্ছা-ঘটনা বিক্ষিপ্ত ও অসংলগ্নভাবে উদিত হয়, এবং সে-স্মৃতিবিকারজাত প্রতিক্রিয়ায় সে তার স্ত্রীকে গুরুতরভাবে আহত করে। প্রতিবেশীদের হাতে কিশোর প্রহৃত হয় নির্মমভাবে। এ-দুঃখময় ও অপ্রত্যাশিত ঘটনার দিন চারেকের ব্যবধানে নাটকীয়ভাবে উভয়ের জীবনাবসান ঘটে। সে-সঙ্গে সমাপ্ত হয় একটি বিচিত্র বিবাহ-কাহিনী।

তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসের তৃতীয় খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ের নাম 'রামধনু'। এ-অধ্যায়ে অদ্বৈত মল্লবর্মণ নিঃস্ব বালক অনন্তের অসহায়-উদাস ও কল্পনাপ্রবণ মনোদৃষ্টিকেই কেবল উপস্থাপন করেন নি, সে-সঙ্গে তিতাস-তীরের মৃত্তিকামূলসংলগ্ন মানুষের জীবনচিত্রও অঙ্কন করেছেন। কৃষক আর ধীবরের সৌহার্দ্যময় সম্পর্ক উপস্থাপনসূত্রে লেখক এ-অঞ্চলের অসাম্প্রদায়িক ভাবনা-চেতনাও পরিবেশন করেছেন :

> ... এরা জেলে। চাষার জীবনের মতই এদের জীবন। উঁচু বলিয়া মানের ধূলি নিক্ষেপ করা যায় না এদের উপর, বরং সমান বলিয়া গলা জড়াইয়া ধরিতেই ভাল লাগে। কাটিলে কাটা যাইবেনা, মুছিলে মুছা যাইবেনা, এমনি যেন একটা সম্পর্ক আছে জেলেদের সঙ্গে চাষীদের।[১২]

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিতে যেমন তিতাস-তীরবর্তী মানুষের অসাম্প্রদায়িক জীবনচেতনা পরিস্ফুট হয়েছে, ঠিক তেমনি তাদের সংবেদনশীল মনোদৃষ্টিও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মায়ের মৃত্যুর পর এরকম উদার সংবেদনশীল জীবন-পরিবেশে অনন্ত আশ্রয় খুঁজে পায়। অর্থনৈতিক অনটন সত্ত্বেও বাসন্তী অনন্তকে মাতৃস্নেহে লালন করে। কিন্তু বালক অনন্ত অনন্তপথের অভিযাত্রিক। সংসারের সীমাবদ্ধ আঙিনা ছেড়ে সে ছড়িয়ে পড়তে চায় প্রকৃতির বিশাল সৌন্দর্যলোকে। এ-উপন্যাসে মায়ের মৃত্যুর পর অনন্তের বাধাবন্ধনহীন স্বেচ্ছাবিহারী অবস্থাকেই শুধু চিত্রিত করেন নি লেখক, সে-সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন মায়ের মৃত্যুর পর অনন্তের মাসাধিক কাল পালিত হবিষ্য-প্রথা। বনমালীর দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাসঙ্গিক বর্ণনা লক্ষণীয় :

> ছেলেটার গায়ের রঙ ফর্সা। কিন্তু খড়ি জমিয়া বর্ণলালিত্য নষ্ট করিয়া দিয়াছে। একচিলতা সাদা মাঠা-কাপড় কটিতে জড়ানো। আর এক চিলতা কাঁধে। বিঘৎ পরিমাণ একখানা কুশাসন ডান হাতের মুঠায় ধরা। নৌকা গড়িবার সময় তক্তায় তক্তায় জোড়া দেয় যে দুই মুখ সরু চ্যাপ্টা লোহা দিয়া, তারই একটা দুইমুখ এক করিয়া কাপাস সূতায় গলায় ঝুলানো। পিতামাতা মারা যাওয়ার পর মাসাবধি হবিষ্য করার সন্তানের এই সমস্ত প্রতীক।[১৩]

পিতামাতার মৃত্যুর পর পুত্র-মাত্রেরই এটি পালনীয় বিধি-ব্যবস্থা। চালচুলোহীন কিশোর অনন্ত বাসন্তীর সহযোগিতায় হবিষ্য-সংক্রান্ত যে-সব আচার-প্রক্রিয়া পালন করেছে তা নিম্নরূপ :

> ... বাজার হইতে কিছু আলো চাল আর দুই একটা কলা আনাইতে পারা যায়। সে চাল দিয়া সুবলার বউ মালসায় জাউ রাঁধিয়া দেয়। কলার খোল কাটিয়া সাতখানা ডোঙ্গা বানায়। তাতে জাউ আর কলা দিয়া তুলসীতলায় সারি সারি সাজায়। অনন্ত স্নান করিয়া আসিয়া তাতে জল দেয়। সরিয়া পড়িলে কাকেরা আসিয়া উহা ভক্ষণ করে।[১৪]

মালোপাড়ায় মাতৃশ্রাদ্ধের প্রথা-পদ্ধতিও অদ্বৈত মল্লবর্মণ অনন্তের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন :

> শ্রাদ্ধের দিন ... নাপিত আসিয়া অনন্তর মস্তক মুণ্ডন করিয়া গেল। অনন্ত কতকগুলি খড়ের উপর শুইত, সেই খড়গুলি, হাতের আধছেঁড়া নিত্যসঙ্গী কুশাসনখানা, কাঁধের ও কটিদেশের মাঠা-কাপড়ের চিলতা দুইখানা ... নদীতীরে ঘাটের একটু দূরে কাদায় পুঁতিয়া স্নান করিয়া আসিল। ...
>
> লম্বা একটা খোলে ভাতব্যঞ্জন সাজাইয়া সুবলার বউ বলিল,
>
> 'রাঁড়িবে শেষ খাওন খাওয়াইয়া দেই, আর ত কোনদিন খাইতে আইবনা'।

খোলের এক কোণে একটু পান সুপারি, একটু তামাক টিকাও দেওয়া হইল। ...

অনন্ত জন্মের মত মাকে শেষ খাবার দিয়া ... বাড়ি চলিয়া আসিল।[১৫]

মাতৃশ্রাদ্ধের দিন কয়েক পর গোকণঘাট পরিত্যাগ করে অনন্ত চলে যায় নবীনাগর গ্রামে — উদয়তারার পিত্রালয়ে। অনন্তকে কেন্দ্র করে বাসন্তীদের পারিবারিক কলহ যখন চরমে, তখন অসহায় অনন্ত আশ্রয় নেয় উদয়তারার কাছে। স্থান পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনন্তের দৃষ্টিপথে উন্মোচিত হয় নতুন দিগন্ত।

নবীনাগর গ্রামের নতুন পরিবেশে অনন্তের কৈশোরক মন নিত্যনব অভিজ্ঞতায় আন্দোলিত হয়। এ-গ্রামে শ্রাবণমাসব্যাপী মনসার গান, পদ্ম-পুরাণ পাঠ, বেহুলার চির-এয়োতির স্মারক-উৎসবরূপে 'জালা-বিয়া'র আয়োজন প্রভৃতি উৎসব-অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে অনন্তের বৈচিত্র্যপিয়াসী মন সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। 'জালা-বিয়া'র উৎস ও প্রকৃতি সম্পর্কে এ-উপন্যাসে লেখকের অভিজ্ঞতালব্ধ বর্ণনা নিম্নরূপ :

> শ্রাবণ মাস শেষ হইয়াছে, পদ্মাপুরাণও পড়া শেষ হইল। ঘরে ঘরে মনসা পূজার আয়োজন করিয়াছে। আর করিয়াছে 'জালা-বিয়া'র আয়োজন। বেহুলাসতী মরা লখিন্দরকে লইয়া পুরীর বাহির হইবার সময় শাশুড়ী ও জা'দিগকে কতকগুলি সিদ্ধ ধান দিয়া বলিয়াছিল, আমার স্বামী যেদিন বাঁচিয়া উঠিবে, এই ধানগুলিতে সেদিন চারা বাহির হইবে। চারা তাতে যথাকালেই বাহির হইয়াছিল। এই ইতিহাস পুরাণ-রচয়িতার অজানা হইলেও মালোপাড়ার মেয়েদের অজানা নাই। তারা বেহুলার এয়োস্তালির স্মারক চিহ্নরূপে মনসা পূজার দিন এক অভিনব বিবাহের আয়োজন করে। ধানের চারা বা জালা এর প্রধান উপকরণ। তাই এর নাম জালা-বিয়া। এক মেয়ে বরের মত সোজা হইয়া চৌকিতে দাঁড়ায়, আরেক মেয়ে কনের মত সাতবার তাকে প্রদক্ষিণ করে, দীপদানির মত একখানি পাত্রে ধানের চারাগুলি রাখিয়া বরের মুখের কাছে নিয়া প্রতিবার নিছিয়া-পুঁছিয়া লয়। এইভাবে জোড়ায় জোড়ায় নারীদের মধ্যে বিবাহ হইতে থাকে আর একদল নারী গীত গাহিয়া চলে।[১৬]

শ্রাবণের চূড়ান্ত দিন পর্যন্ত পদ্ম-পুরাণ পড়া হয়, কিন্তু সম্পূর্ণ পুঁথি সমাপ্ত করা হয় না। লখিন্দরের পুনর্মিলন ও মনসা-বন্দনা পর্যন্ত পড়ে অবশিষ্ট দুটো পরিচ্ছেদ পড়া হয় ভাদ্র মাসের প্রথম দিবসে। এদিন মালোরা জাল বাইতে যায় না, পদ্ম-পুরাণ গান করে, আর খোল-করতাল বাজিয়ে উল্লাস করে। অবশেষে উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করে পূজার আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে।

নবীনাগর গ্রামে উদযাপিত পূজ-পার্বণের মাধ্যমে অনন্তের মানসজগতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে পরিবর্তনের ইঙ্গিত। এ-গ্রামে এসে কিশোরী অনন্তবালার সঙ্গে সে হার্দ্যসম্পর্কে ঘনিষ্ঠ হয়। অনন্তের বেদনা-বিষাদময় জীবনযাত্রায় এ-সম্পর্ক হয়ে ওঠে মহার্ঘ্যস্বরূপ।

এ-উপন্যাসের তৃতীয় খণ্ডের আরেকটি অধ্যায় হচ্ছে 'রাঙানাও'। এ-অধ্যায়ে তিতাসের স্থানিক বর্ণিমা, স্বরূপবৈশিষ্ট্য বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। পুরো অধ্যায়টি নৌকা বাইচকে কেন্দ্র করে রচিত। নৌকা বাইচের সঙ্গে তিতাস-তীরবর্তী মানুষের রয়েছে আত্মিক সংযোগ। বিরামপুরের সচ্ছল কৃষক কাদিরের পুত্র ছাদিরের নৌকা নির্মাণ, প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ, ছাদির-পুত্র রমুর শিশুতোষ আহলাদ, বাইচ-নৌকার আরোহী ও প্রতিযোগীদের বাউল-ভাটিয়ালি-সারি গানে উৎক্ষিপ্ত হৃদয়তাপ — সমস্তই

তিতাস-তীরের আবেগায়িত, স্বতঃস্ফূর্ত জীবনভাবনাকে প্রতিফলিত করেছে। নৌকাবাইচের প্রসঙ্গ উপস্থাপনসূত্রে ঔপন্যাসিক কাদিরের তৃতীয় প্রজন্ম পর্যন্ত ঘটনাপ্রবাহকে যেমন শিল্পরূপ দিয়েছেন, তেমনি অনন্তের কৈশোরক ভাবনাও প্রকাশ করেছেন। এর মাধ্যমে লেখক যেন জীবনের বহমানতা ও চলমানতাকে সত্যস্বরূপে উদ্ভাসিত করে তুলেছেন। নৌকা-নির্মাণ ও বাইচের সময় গীত গানগুলো এ-অঞ্চলের ভাব-ভাবনা ও অনুভব-উপলব্ধিকেই শুধু ধারণ করে নি, বরং লোকায়ত মানুষের হার্দ্য-উচ্চারণ হিসেবে এগুলো নির্মাণ করেছে আবেগাশ্রিত ঘটনাবর্ত।

তিতাসে নৌকা বাইচের উৎসবে অনন্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় বাসন্তীর। অনন্তকে দেখে বাসন্তীর প্রতিহত স্নেহ অকস্মাৎ রূপান্তরিত হয় হিংস্রতায়। যার পরিপ্রেক্ষিতে সে অনন্তকে নির্দয়ভাবে প্রহার করে। সে-সূত্রে বাসন্তীও উদয়তারাদের হাতে প্রহৃত ও লাঞ্ছিত হয়। এ-লাঞ্ছনা বাসন্তীর জীবনকে করে দেয় এলোমেলো ও বিক্ষিপ্ত। অদূর অতীতের স্মৃতিচারণে সে হয়ে ওঠে করুণার্দ্র, বেদনাভারাক্রান্ত।

তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসের চতুর্থ খণ্ডের প্রথম অধ্যায় হচ্ছে 'দুরঙা প্রজাপতি'। বাসন্তীর হৃদয়ের বেদনাভার উপস্থাপনের মাধ্যমে এ-অধ্যায়ের ঘটনাংশ উন্মোচন করেছেন লেখক। তিতাস-তীরবর্তী মালো-সম্প্রদায়ের আত্ম-অবলুপ্তির করুণ-বিষাদ তথ্যচিত্রের সঙ্গে একাকার করে ঔপন্যাসিক বাসন্তীর আত্মদহনকে পরিবেশন করেছেন উপন্যাসে।

একটি সম্প্রদায় বা জনগোষ্ঠীর নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য-বৈশিষ্ট্যের অবলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রাত্যহিক ও সামাজিক জীবনাচারে কী গভীর ও ব্যাপক বিপর্যয়ের উদ্ভব ঘটে তা' ঔপন্যাসিক অঙ্কন করেছেন নিপুণভাবে। মালোদের সহজ-সরল প্রাকৃত জীবনযাপন ও সুদৃঢ় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মর্মমূলে ধীরে ধীরে অনুপ্রবিষ্ট হতে শুরু করে সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের ধ্বংসবীজ। একদা তাদের যে ঐক্য ছিলো বজ্রের মতো দৃঢ়-সংবদ্ধ, তা ক্রমশ হয়ে পড়ে শিথিল। 'পাড়ার ভিতর যাত্রার দল ঢুকিয়া সেই ঐক্যে ফাটল ধরাইয়া দিল'। অর্থনৈতিক বিপন্নতাই এর অন্তর্নিহিত কার্যকারণ :

> যাত্রাদলের যারা পাণ্ডা, তারা অর্থে ও বুদ্ধিতে মালোদের চেয়ে অনেক বড়। তারা অনেক শক্তি রাখে। কিন্তু একসঙ্গে সর্বশক্তি প্রয়োগ না করিয়া, অল্পে অল্পে প্রয়োগ করিতে লাগিল। যেদিন বিরোধের সূত্রপাত হইয়াছিল তার পরের দিন তারা তামসীর বাপের বাড়িতে আরও জাঁকিয়া বসিল। এতদিন ছিল শুধু তবলা, এবার আসিল হারমনিয়াম, বাঁশি ও বেহালা। গীতাভিনয়ের তিন রকমের তিনটা বই আসিল।[১৭]

যাত্রাদলের আবির্ভাবের প্রথম পর্যায়ে মালোপাড়ার বয়স্থরা তাদের সন্তানদের যাত্রাদলে যোগ দিতে নিষেধ করলো। কারণ :

> তারা বিড়ি খায়, ঘাড়-কাটা করিয়া চুল ছাঁটে, গুরুজনের সামনে বেলাহাজ কথা বলে। ঠাকুর দেবতার গান ছাড়িয়া পথে ঘাটে সখীর গানে টান দেয়, এতে তাদের স্বভাব চরিত্র খারাপ হইয়া যায়।[১৮]

কিন্তু বাধ্যবাধকতা অধিক দিন স্থায়ী হয় না। আধুনিক চটুল ও বর্ণসংকর রুচি-আমোদের প্রভাবে মালোদের বিশুদ্ধ প্রাকৃত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিপর্যয়ের প্রান্তসীমায় উপনীত হয়। মালোপাড়ার ছেলেরা শুধু যাত্রাভিনয়েই অংশ নেয়না, নৃত্য-গীতে, ভাবে-ভাষায়-ভঙ্গিতে বিস্মিত করে অশিক্ষিত লোকায়ত

তিতাস-বিধৌত জনমানুষকে। এ-আরোপিত সংস্কৃতি যে কতটুকু ধ্বংসাত্মক ও বিপদাত্মক তা প্রমাণিত হয় অতি সহসা; যখন সুবলের বিধবা স্ত্রী বাসন্তী যাত্রাদলের অভিনেতা পাটনীপাড়ার অশ্বিনীর অমার্জিত আচরণ ও দুষ্কর্মের লক্ষ্য হয়।

মালো সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি সমাজের নিম্নতম স্তর পর্যন্ত তার আবেদন সঞ্চারিত করে সর্বসাধারণকে রুচি ও অনুভূতির মহিমান্বিত পর্যায়ে উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছিলো। এর কারণ তার অসাধারণ প্রাণশক্তি। উপন্যাসের এতদ্‌সংক্রান্ত একটি বিবরণ লক্ষণীয় :

> মালোদের নিজস্ব একটা সংস্কৃতি ছিল। গানে গল্পে প্রবাদে এবং লোকসাহিত্যের অন্যান্য মাল মসলায় সে সংস্কৃতি ছিল অপূর্ব। পূজায় পার্বণে, হাসি ঠাট্টায় এবং দৈনন্দিন জীবনের আত্মপ্রকাশের ভাষাতে তাদের সংস্কৃতি ছিল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। মালো ভিন্ন অপর কারো পক্ষে সে সংস্কৃতির ভিতরে প্রবেশ করার বা তার থেকে রস গ্রহণ করার পথ সুগম ছিল না। কারণ মালোদের সাহিত্য-উপভোগ আর সকলের চাইতে স্বতন্ত্র। পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত তাদের গানগুলি ভাবে যেমন মধুর, সুরেও তেমনি অন্তরস্পর্শী। সে ভাবের, সে সুরের মর্মগ্রহণ অপরের পক্ষে সুসাধ্য নয়। ইহাকে মালোরা প্রাণের সঙ্গে মিশাইয়া নিয়াছিল, কিন্তু অপরে দেখিত ইহাকে বিদ্রূপের দৃষ্টিতে। আজ কোথায় যেন তাদের সে সংস্কৃতিতে ভাঙ্গন ধরিয়াছে।[১৯]

মালোপাড়ার প্রাকৃত সংস্কৃতিতে ভাঙনের শব্দ যখন সুস্পষ্ট, তখনও বাসন্তী ও মোহন মালো-সংস্কৃতিতে আবিষ্কার করেছে আত্ম-আবিষ্কার ও সত্তানুসন্ধানের বীজশক্তি। প্রায় হৃত-ঐতিহ্যকে তারা সুরে-তালে উজ্জীবিত করে তোলার প্রয়াস পায়। বৈষ্ণবীয় গানের ললিত সুর ঝঙ্কারে তারা একদিন সান্ধ্য আসরে মাতিয়ে তোলে মালোপাড়ার বিস্তীর্ণ জনপদ। অবস্থাপন্ন কালোবরণদের বাড়ির আঙিনায় যখন যাত্রাওয়ালারা আসর বসায়, তখন মোহন-বাসন্তীর দল 'খঞ্জনী-রসমাধুরীর যন্ত্র' সহযোগে শুরু করে দেহতত্ত্ববিষয়ক গান, বিচ্ছেদ গান, হরিবংশ গান, নাম গান প্রভৃতি। এসব গানের মাধ্যমে রাত্রিব্যাপী মালোরা বিপুল আবেগ ও উদ্যমে তাদের জমাট বেদনা ও আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করে হয়ে ওঠে শুদ্ধ, শান্ত, উদার ও প্রসন্ন। কিন্তু নিজস্ব সংস্কৃতির লালন ও বিকাশের প্রতি মালো সম্প্রদায়ের এ-উদার দৃষ্টিভঙ্গির স্থায়িত্বকাল অতি স্বল্প। সুলভ চাকচিক্যময় আধুনিক 'বাবু' সংস্কৃতির পাদমূলে তাদের অমূল্য সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার মুখ থুবড়ে পড়ে :

> ... দুইদিন পরে যখন কালোবরণদের বাড়িতে বাক্স বাক্স সাজ আসিল, এবং রাত্রিতে যখন সাজ পোষাক পরিয়া সত্যিকারের যাত্রা আরম্ভ হইল, মালোরা তখন সব ভুলিয়া যাত্রার আসর ভরিয়া তুলিল। বালক বৃদ্ধ নারী পুরুষ কেউ বাদ রহিল না। সকলেই গেল। মাত্র দুইটি নরনারী গেল না। তারা সুবলার বউ আর মোহন। অপমানে সুবলার বউ বিছানায় পড়িয়া রহিল, আর বড় দুঃখে মোহনের দুই চোখ ফাটিয়া জল আসিতে লাগিল।[২০]

মালোদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের অবলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাদের জীবনে যে করুণ বিপত্তি নেমে আসে তা অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী ভঙ্গিতে অদ্বৈত মল্লবর্মণ পরিবেশন করেছেন চতুর্থ খণ্ডের 'ভাসমান' অধ্যায়ে। যখনই মালোরা আত্মসংস্কৃতিতে উদাসীন, নিস্পৃহ ও বীতরাগ হয়, তখনই বিনষ্টির মুখোমুখি হয় তাদের সমাজ-সংহতি, সহযোগিতামূলক মনোবৃত্তি, অর্থনৈতিক সচ্ছলতা, জীবনের মর্যাদাবোধ ও অস্তিত্বরক্ষার স্পৃহা। তাদের জীবনযাত্রা পরিবর্তিত হয়, এবং তারা উপার্জনে হয়

নিরুৎসাহিত। এ-সুযোগে আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয় যাত্রাদলের লোকেরা। তাদের অবিরাম আনাগোনায় অন্তঃপুরের নারীলক্ষ্মীরা শুচিতা হারায়। তবুও হৃতবল মালোসম্প্রদায় প্রতিবাদ করার সাহস পায় না।

ক্রমশ অন্তঃপুরের নারীরা বিলাসী জীবনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। তারা আধুনিক প্রসাধন সামগ্রীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাদের জীবনযাপন প্রণালী হয়ে পড়ে এলোমেলো, অগোছালো। মনুষ্যত্বের পর্যায় থেকে তারা অধোগামী হয়। ইতোমধ্যে তাদের অনবধান জীবনপরিসরে যুক্ত হয় ভিন্ন বিপর্যয়। এ-বিপর্যয়ের উৎস ও ধরন তাদের জীবনাভিজ্ঞতায় অভিনব :

> গ্রামের কয়েকজন উৎসাহী ধনী ব্যক্তি মালোদের জন্য এখানে শহর হইতে ঋণদান কোম্পানীর একটা শাখা আনিয়াছিল। সুদ খুব কম দেখিয়া মালোরা সকলেই হুজুগে মাতিয়া টাকা ধার করিয়াছিল। সে অনেক দিনের কথা। সেই থেকে প্রতিবৎসর চক্রবৃদ্ধি হারে কেবলই সুদই যোগাইয়া আসিয়াছে, আসল আদায় হওয়া দরকার। তাই তারা পেয়াদা-সঙ্গে জবরদস্ত বাবু পাঠাইয়াছে। তার নাম বিধুভূষণ পাল। গ্রামের পালেদের সঙ্গে তার আত্মীয়তা ছিল। তাদের নিকট মালোদের প্রকৃত অবস্থা জানিয়া লইয়া মালোপাড়াতে আসিয়া রুদ্রমূর্তি ধরিল। বুড়া বুড়া মালোদের দাড়ি ধরিয়া টানিয়া জলে নামাইল। ... সব ছাঁকিয়া তুলিয়াও তেমন কিছুই আদায় হইলনা দেখিয়া শেষে তারা ঘরের থালা ঘটি বাটি, সূতার হাঁড়ি জালের পুঁটুলি বাহির করিয়া নিয়া ঘোড়ার গাড়িতে তুলিয়া চলিয়া যাইত। এরপর পড়িয়া যাইত কান্নাকাটির ধুম।[২১]

কিন্তু জীবন তো চলমান, বহমান। এ-জীবনস্রোতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মালোরাও অস্তিত্বরক্ষার উপায় আবিষ্কার করে, এবং নব উদ্যমে শুরু করে জীবনযাপন :

> আবার তিতাস নদীতে মাছ পড়ে। আবার তাদের হাতে পয়সা আসে। হারানো থালা ঘটি বাটি নূতন হইয়া ফিরিয়া আসে। ঘরে ঘরে সূতা কাটার ধূম পড়ে। নূতন নূতন জাল তৈয়ার হয়। সে জালে নানা জাতের মাছ পড়ে। মালোদের মুখে আবার হাসি ফোটে।[২২]

স্বল্পকাল ব্যবধানে এ-হাসিও উধাও হয় মালোদের জীবন থেকে। যে-তিতাস ছিলো তাদের জীবন-জীবিকার একমাত্র অবলম্বন, সে-তিতাসও অবশেষে বিরূপ হয়। অকস্মাৎ তিতাসের বুক ফুঁড়ে জেগে ওঠে নতুন চর। এর ফলে মালোদের ধনাগম-উৎস বন্ধ হয়ে যায়, সর্বনাশের গতি হয় তীব্রতর।

অবশেষে চরের দখল নিয়ে শুরু হয় তীব্র প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতায় মালো সম্প্রদায় থাকে নির্বিকার, উদাসীন। রামপ্রসাদ চর দখলের জন্য মালোদের উজ্জীবিত করে তুলতে চায়, কিন্তু ব্যর্থ হয়। কারণ—

> নিজেদের মধ্যে দীর্ঘকাল দলাদলির ফলে তারা একযোগে কাজ করার ক্ষমতা একেবারেই হারাইয়া ফেলিয়াছিল। তাই মারামারির নাম শুনিয়া আঁতকাইয়া উঠিল। বলিল : গাঙ শুখাইয়া জল গিয়াছে, তার সঙ্গে আমরাও গিয়াছি, এখন মাটি নিয়া কামড়া-কামড়ি করিতে আমরা যাইব না।[২৩]

তবুও চরদখল নিয়ে জোতদারদের সঙ্গে লড়াই করে রামপ্রসাদ, এবং বরণ করে নেয় মৃত্যুভাগ্য। চরের অধিকার থেকে শুধু মালোরাই বঞ্চিত হয় না, বঞ্চিত হয় ভূমিহীন কৃষকও।

অতঃপর মালো সম্প্রদায় নিক্ষিপ্ত হয় নির্মম ও হৃদয়বিদারক পরিণতির দিকে। ক্রমশ তাদের অনেকেই বাস্তুচ্যুত হয়। কেউ চাকরি নেয় মহাজনের নৌকায়, কেউবা শহরে গিয়ে মালের বস্তা টেনে কোমর ভাঙে। অদ্বৈত মল্লবর্মণ উপন্যাস-অন্তর্গত কয়েকটি চরিত্রের বিপর্যয়-দশা অঙ্কনসূত্রে মালোপাড়ার দুঃসহ বাস্তবতা যেভাবে উন্মোচন করেছেন তা নিম্নরূপ :

> সুবলার বউ এতদিন সারারাত সূতা কাটিয়া অশক্ত বাপ-মার আর নিজের অন্ন জোগাইয়াছে। এখন আর কেউ সূতা কিনিতে আসেনা। এখন সে উদয়তারাকে লইয়া 'গাওয়ালে' যায়। পান সুপারি আর কিছু পোড়ামাটি লইয়া সারাদিন গ্রামে গ্রামে ঘোরে, সন্ধ্যাবেলা এক এক পুঁটলি ধান লইয়া মেঠো পথ বাহিয়া ঘরে ফেরে।
>
> কিন্তু তাতে কয়েক আনা পুঁজির দরকার। যাদের তাও নাই, তারা আর কি করে, দাঁতে দাঁত চাপিয়া ভিক্ষায় বাহির হইয়া পড়ে। জয়চন্দ্রের বউ এই দলের। ... অনেক দূরের গ্রামে গিয়া বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করে। ফিরিয়া আসে সন্ধ্যার পর। ভয় হয় পাছে ধরা পড়ে। কিন্তু ধরা যেদিন পড়িল, সেদিন তার জয়জয়কার! আরও পাঁচজনে তাকেই অনুসরণ করিয়া ভিক্ষায় বাহির হইল। ...[২৪]

উপন্যাসের অন্তিম পর্যায়ে মহামারীর মতো মৃত্যু এসে মালোদের করে দেয় সর্বস্বান্ত ও নিশ্চিহ্ন। সমস্ত প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম করে কোনোরকমে টিকে থাকে বাসন্তী আর কিশোরের বৃদ্ধ পিতা রামকেশব। অনন্ত কুমিল্লার শাহরিক পরিবেশে শিক্ষিত হয়ে গড়ে উঠলেও গোকর্ণঘাটের মালো সম্প্রদায়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক মেরুদূর। অনন্তবালারা চলে যায় আসামে। নিস্তব্ধ ও প্রায়লুপ্ত বিশাল মালোপাড়া কালের সাক্ষী হয়ে হতশ্রী রূপ নিয়ে পড়ে থাকে। উপন্যাসের একেবারে অন্তিমে লেখক মালোপাড়ার যে হতদশা অঙ্কন করেছেন তা একান্ত হৃদয়স্পর্শী :

> ধানকাটা শেষ হইয়া গিয়াছে। চরে আর একটিও ধানগাছ নাই। সেখানে এখন বর্ষার সাঁতার-জল। চাহিলে কারো মনেই হইবেনা যে এখানে একটা চর ছিল। জলে থই থই করিতেছে। যতদূর চোখ যায় কেবল জল। দক্ষিণের সেই সুদূর হইতে ঢেউ উঠিয়া সে ঢেউ এখন মালোপাড়ার মাটিতে আসিয়া লুটাইয়া পড়ে। কিন্তু এখন সে মালোপাড়ার কেবল মাটিই আছে। সে মালোপাড়া আর নাই। শূন্য ভিটাগুলিতে গাছ-গাছড়া হইয়াছে। তাতে বাতাস লাগিয়া সোঁ সোঁ শব্দ হয়। এখানে পড়িয়া যারা মরিয়াছে, সেই শব্দে তারাই বুঝিবা নিঃশ্বাস ফেলে।[২৫]

তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসে অদ্বৈত মল্লবর্মণ তিতাস-তীরের স্থানিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে এতদঞ্চলের মালো সম্প্রদায়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা, হতাশা-বেদনা এবং পরাজয়-পতনের বিস্ময়কর কাহিনী শিল্পসফলভাবে উপস্থাপন করেছেন। সমাজজীবনের অন্তর্কাঠামোর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বহির্কাঠামো অর্থাৎ চৈতন্যপ্রবাহও যে পরিবর্তিত হয়ে যায় তা এ-উপন্যাসের বিপুল পরিসরে প্রত্যক্ষ করা যায়।

এ-উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র রক্তমাংসময় চরিত্র নয়। এর কেন্দ্রীয় চরিত্র স্বয়ং তিতাস নদী। তিতাসকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্র আবর্তিত হয়েছে। তিতাস ছাড়া কোনো চরিত্রই আদি-মধ্য-অন্ত্য-সমন্বিত সমগ্র নয়। কিশোর, কিশোরের স্ত্রী, সুবল, বাসন্তী, অনন্ত কেউই এ-উপন্যাসে বিকশিত হয়ে ওঠে নি। বিশেষ কোনো চরিত্র নয়, মূলত তিতাস নদী এবং নদী-তীরবর্তী সমগ্র মানুষের জীবনালেখ্য রচনাই ছিলো লেখকের অন্তর্গত উদ্দেশ্য। লেখক তিতাসের বহমানতার সঙ্গে তার তীরবর্তী জনপদকে একীকরণ করে অঙ্কন করেছেন। যতদিন তিতাস-তীরের অধিবাসীরা

ছিলো আত্মচেতন, প্রাণরসে উদ্দাম, ততদিন তিতাস নদীও ছিলো বহমান ও চলমান। পক্ষান্তরে যখনই তিতাস-তীরবর্তী পরিশ্রমজীবী মালো সম্প্রদায় হয়ে পড়ে আত্ম-উদাসীন, আত্মসংস্কৃতিবিরূপ, তখন তিতাসও হয়ে পড়ে বন্ধ্যা ও স্থবির। নদীর সঙ্গে নদীনির্ভর জনপদের এ সমন্বয়-কল্পনা সত্যিই অসাধারণ।

তিতাস একটি নদীর নাম প্রধানত লেখকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণে রচিত। মালো সম্প্রদায়ের জীবন-পরিবেশের সঙ্গে আজন্ম-পরিচিত অদ্বৈত মল্লবর্মণের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণে উপন্যাসটি রচিত হওয়ায় এর ঘটনাংশ হয়ে উঠেছে এতদঞ্চলের সমগ্রতাবোধ-উৎসারিত। "নদীর যেমন বিশেষের প্রতি কোনো পক্ষপাত নেই, কাহিনীও তেমনি এখানে বিশেষ কিছুর ঘাটে বাঁধা নয়। এখানে স্নিগ্ধ বিষণ্ন জীবনের করুণ শ্রীটুকু পলকে-পলকে মূর্তিধারণ করেছে — এবং কোনো ভাবপ্রবণ অশ্রুর মূল্যে সে কারুণ্যকে অমর্যাদা করতে হয় না। উপন্যাস পাঠের ফলশ্রুতি 'তিতাস একটি নদীর নাম' পাঠ করে অবশ্যই মেলেনা। সেই পূর্ণবৃত্ত অভিজ্ঞতার সমগ্র রসরূপ এখানে নির্মিত হয়নি, এও ঠিক। কিন্তু জীবনমুগ্ধতার অক্ষয় সম্পদের একটা সমালোচনা-নিরপেক্ষ শ্রী আছে, সেই সম্পদে বইখানি সম্পন্ন।"[২৬]

তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসে অদ্বৈত মল্লবর্মণ প্রধানত বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি ব্যবহার করলেও কখনও কখনও তিনি গীতময় ও চিত্রময় অনুষঙ্গও ব্যবহার করেছেন। একটি উদ্ধৃতি লক্ষণীয় :

> বাংলার বুকে জটার মতো নদীর প্যাঁচ। সাদা, ঢেউ-তোলা জটা। কোন্ মহাস্থবিরের চুম্বন রস-সিক্ত বাংলা। তার জটাগুলি তার বুকের তারুণ্যের উপর দিয়া সাপ-খেলানো জটিলতা জাগাইয়া নিম্নাঙ্গের দিকে সরিয়া পড়িয়াছে। এ সবই নদী।[২৭]

উপন্যাসে লেখকের শিল্পসৌন্দর্যবোধের উদ্বোধন বিস্ময়কর। প্রেম ও লিবিডো বিষয়ে তাঁর বর্ণনা রসব্যঞ্জনাময়। বসন্তের হোলি উৎসবে স্ত্রীর আবির-প্রলিপ্ত হস্তস্পর্শে কিশোরের মস্তিষ্ককোষের অবচেতন গহ্বরে পূর্বস্মৃতির প্রতিক্রিয়াজাত যে দৃশ্য সংঘটিত হয় তা' লেখক শব্দরূপ দিয়েছেন শিল্পিত অনুষঙ্গে :

> হোলির আসর ভাঙ্গিয়া লোকজন তখন ছুটিয়া আসিয়া পড়িয়াছে। কিশোর একবার লোকজনের দিকে আর একবার মেয়েটার দিকে চাহিতে লাগিল। তার চোখ দুটি আরও বড়, আরও লাল হইয়াছে। মেয়েটার খোঁপা খুলিয়া গিয়া, সাপের মত লম্বা চুল মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়াছে। বুকটা চিতাইয়া উচুঁ হইয়া উঠিয়াছে। এত উঁচু যে, কিশোরের নাকের নিঃশ্বাসে তার আবরণটুকুও সরিয়া যাইতেছে। সে মূর্ছা গিয়াছে। তার বুকের কাপড় শীঘ্রই সরিয়া গেল। কিশোর পুরাপুরি পাগল হইয়া সে বুকে মুখ ঘষিতে লাগিল। দাড়ি গোঁফের জবরজঙ্গিমায় বুঝিবা সেই নরম তুলতুলে বুকখানা উপড়াইয়া যায়।[২৮]

উপমা-অলঙ্কার চয়নে অদ্বৈত মল্লবর্মণ তিতাস-তীরের জীবনাভিজ্ঞতাকে রূপময় করে তুলেছেন এ-উপন্যাসে। যেমন :

> ১. রামপসাদ কিছুই কহিল না। তিতাসের শুশুক মাছগুলি যেমন সন্ধ্যার ছায়া পাইয়া ভাসিয়া নিঃশ্বাস ছাড়ে, জালের পুঁটুলিগুলির উপর বসিতে বসিতে ফোস্ করিয়া একটা নিঃশ্বাসের শব্দ তার নাক দিয়া বাহির হইল।[২৯]
>
> ২. এমন সময় দেখা গেল পরিচিত জেলে নৌকা, সন্ধ্যায় ঘরে-ফেরা সাপের মত তিতাসের দীঘল বুকে সাঁতার দিয়াছে।[৩০]

উপন্যাসে প্রচুর প্রবাদ-প্রবচন ব্যবহার করেছেন ঔপন্যাসিক ; যেগুলো তিতাস-তীরবর্তী মানুষের মনোভাব, বিশ্বাস-সংস্কার, উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতার দীপ্ত উদ্বোধক। যেমন : 'জিভে কামড় শিরে হাত, কেমনে আইল জগন্নাথ'; 'আ-ঘাটাতে চন্দ্র উদয়'; 'শিবের মতন চোখ'; 'শ্বশুরের বিছানায় বউ শোয়ানো'; 'জামাইর বিছানায় শাশুড়ী শোয়ানো'; 'পুত ত কুত্তার মুত'; 'শ্যাওড়া গাছের কাওয়া'; 'কাকের মুখে সিন্দুইরা আম'; 'মানুষের কুটুম আসা-যাওয়ায় আর গুরুর কুটুম লেহনে-পুছনে'; 'পরের পাগল হাততালি, আপনা পাগল বাইন্ধা রাখি'; 'মা মরলে বাপ তালই, ভাই বনের পশু'; 'তীর্থের মধ্যে কাশী ইষ্টির মধ্যে মাসী'; 'ধানের মধ্যে খামা কুটুমের মধ্যে মামা'; 'মা নাই যার ছাড় কপাল তার'; 'চৌদ্দ-সানকির তলা' প্রভৃতি।

উপন্যাসে ব্যবহৃত ভাষা লেখকের অভিজ্ঞতার ভাষা। 'তিতাসের স্রোতের মতোই ভাষাতেও এসেছে একটা মৃদু সঙ্গীত — যা জীবনের মৃদু এবং মেদুর, সুখ এবং দুঃখ ধ্বনিত করেছে অসীম নীলাকাশের অঙ্কশায়ী নদীর অস্পষ্ট এবং চিরন্তন তরঙ্গ কল্লোলের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে'।[৩১] তিতাস-তীরবর্তী জনজীবনকে উপস্থাপনের প্রয়োজনে তিনি সে-জীবনের প্রচলিত শব্দ ও বাকরীতি অনুসরণ করেছেন। সংলাপ-নির্মাণেই শুধু নয়, ঔপন্যাসিক-বর্ণনায়ও প্রায়শ ব্যবহৃত হয়েছে লোকজ শব্দ। ভোলা, খেউ, চরকি, টেকো, তকলি, চৌয়ারি ঘর, কাইজ্যা, ডহর, বুলানি, সাইৎ, ক্ষেপ, ভেউরা, খলা-বাওয়া, কোচ, চল, বাইল্যা ক্ষেত, পুলা, টুরি, সেওত, টেকা, তাগা, শিলোক, ছেউ, চোপা, ফুলটুঙি প্রভৃতি শব্দ তিতাস-তীরবর্তী জনজীবনমূল-উৎসারিত।

তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসে অদ্বৈত মল্লবর্মণ মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনায় যে-জীবনসত্য অঙ্কন করেছেন, সে-জীবন নগরকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত-মানসের অভিজ্ঞতা-বহির্ভূত। তিতাসবিধৌত জনপদের স্থানিক বর্ণিমার সঙ্গে সেখানকার মানুষের জীবনযাত্রার বিশ্বস্ত রূপায়ণসূত্রে উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। বাংলাদেশের আঞ্চলিক উপন্যাস-সাহিত্যে এটি একটি কালজয়ী সংযোজন।

তথ্যনির্দেশ

১. "ব্রাহ্মণবাড়িয়ার "গোকর্ণগ্রামের অদ্বৈত মল্লবর্মণদের পাড়াটিকে ভদ্রভাবে মালোপাড়া বলা হলেও সাধারণত এটি 'গাবরদের পাড়া' বলেই বহুল পরিচিত। 'গাবর' শব্দটি সম্ভবত 'গাবুর' (মজুর) থেকে এসেছে। শ্রমজীবী মালোদের প্রতি শ্রমবিচ্ছিন্ন 'ভদ্র' মানুষের ব্যঙ্গ ও অবজ্ঞা থেকেই এই নামের সৃষ্টি।" (উদ্ধৃত, শান্তনু কায়সার, *অদ্বৈত মল্লবর্মণ*, জীবনীগ্রন্থমালা, প্রথম প্রকাশ : ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৯।]

২. অদ্বৈত মল্লবর্মণ, *তিতাস একটি নদীর নাম*, সপ্তম প্রকাশ — পৌষ ১৩৯৫, পুথিঘর, কলিকাতা, পৃ. ১

৩. অদ্বৈত মল্লবর্মণ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪

৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩

৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১১

৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২০

৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৫

৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৬

৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৭
১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৩
১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫১-১৫২
১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৮
১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৭
১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৪
১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৬-২০৭
১৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৪-২৪৫
১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১১-৩১২
১৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১২
১৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৫
২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৩
২১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৬
২২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৭
২৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৩
২৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৫
২৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫০
২৬. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, দ্বিতীয় দে'জ সংস্করণ, ডিসেম্বর ১৯৮৮, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা, পৃ. ৩৮৭
২৭. অদ্বৈত মল্লবর্মণ, *তিতাস একটি নদীর নাম*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০
২৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৮
২৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৮
৩০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৪
৩১. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, পূর্বোক্ত।